ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(১৫টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৫×১০=৫০)

سورة الشعراء (সূরা আশ শুআরা)

১৫০. لماذا سميت السورة بسورة الشعراء؟ - [সূরাটির নাম কেন شعراء রাখা হয়েছে?]
১৫১. ما معنى الشعراء لغة وشرعا؟ - [شعراء শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?]
১৫২. فسر قوله تعالى "وما ارسلناك الا رحمة للعالمين - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وما ارسلناك الا رحمة للعالمين-এর তাফসীর কর।]
১৫৩. اذكر بعض الانبياء المذكورين فى سورة الشعراء - [১নং প্রশ্নে সূরা الشعراء-এ উল্লিখিত কতিপয় নবীর নাম উল্লেখ কর।]
১৫৪. ما معنى قوله تعالى "وما امرناهم الا ليعبدوا الله"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وما امرناهم الا ليعبدوا الله-এর অর্থ কী?]
১৫৫. ما معنى قوله تعالى "ان هذا الا افك افتراه"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان هذا الا افك افتراه-এর অর্থ কী?]
১৫৬. ما الرسالة الاساسية لسورة الشعراء؟ - [সূরা الشعراء-এর মূল বার্তা কী?]
১৫৭. ما هى العبرة من قصة نوح عليه السلام؟ - [হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনির শিক্ষা কী?]
১৫৮. ما هى ابرز علامات يوم القيامة المذكورة فى سورة الشعراء؟ - [সূরা الشعراء-এ বর্ণিত কেয়ামতের প্রধান লক্ষণগুলো কী?]

খ বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (সূরা আশ শুআরা)

১৫০. সূরাটির নাম কেন 'আশ শুআরা' (سُورَةُ الشُّعَرَاءِ) রাখা হয়েছে?

উত্তর:

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনের ২৬তম সূরা 'আশ শুআরা' মক্কায় অবতীর্ণ একটি সুদীর্ঘ সূরা। নামকরণের ক্ষেত্রে কুরআনের একটি সাধারণ নীতি হলো সূরার ভেতরের কোনো বিশিষ্ট শব্দ বা ঘটনার নামে নামকরণ করা। এই সূরার শেষাংশে কবিদের প্রসঙ্গ আসায় এর এই নামকরণ করা হয়েছে।

নামকরণের কারণ:

১. কবিদের আলোচনা: এই সূরার ২২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (আর কবিরা—তাদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরাই)। এখানে 'আশ-শুআরা' (কবিগণ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তৎকালীন আরবে কবিদের ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং তারা ইসলাম ও নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাত। আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় সত্যবাদী ও বিভ্রান্ত কবিদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন।

২. অপবাদের খণ্ডন: মক্কার কাফেররা মহানবী (সা.)-কে 'কবি' এবং কুরআনকে 'কবিতা' বলে অপপ্রচার চালাত। এই সূরায় আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কুরআন কোনো কবির কল্পনাপ্রসূত কাব্য নয়, বরং তা রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহী। যেহেতু এখানে কবি ও কবিতার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে, তাই এর নাম 'সূরা আশ শুআরা' রাখা হয়েছে।

উপসংহার:

নামকরণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ওহী এবং কবিতার মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং মুমিনদের সতর্ক করেছেন যেন তারা বিভ্রান্ত কবিদের অনুসরণ না করে।

---

১৫১. শুআরা (الشُّعَرَاءُ) শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

'আশ-শুআরা' শব্দটি সূরা আশ শুআরায় একটি পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের অনুসারীদের চিহ্নিত করেছেন। এর শাব্দিক ও তাত্ত্বিক অর্থ জানা জরুরি।

আভিধানিক অর্থ:

'আশ-শুআরা' (الشُّعَرَاءُ) শব্দটি আরবি, এটি বহুবচন। এর একবচন হলো 'শা-ইর' (شَاعِرٌ)। শব্দটি 'শি'র' (شِعْرٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত।

১. অনুভব করা: আভিধানিক অর্থে 'শা-ইর' বা কবি তাকেই বলা হয়, যার সূক্ষ্ম অনুভূতিশক্তি বা প্রখর ধীশক্তি আছে।

২. জ্ঞান রাখা: এর অর্থ জানা বা অবগত হওয়া। যে অন্যের অজানা বিষয়গুলো অনুভব করতে পারে।

৩. কাব্য রচয়িতা: পরিভাষায় যিনি ছন্দ ও অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্য রচনা করেন, তাকে কবি বলা হয়।

শরয়ী বা কুরআনিক অর্থ:

কুরআনের পরিভাষায় 'শুআরা' বা কবিদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. বিভ্রান্ত কবি: যারা মিথ্যা, অশ্লীলতা ও কল্পনার জগতে বিচরণ করে এবং নিজেরা যা বলে তা করে না। কুরআনে এদের নিন্দা করা হয়েছে।

২. মুমিন কবি: যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করে ও সত্যের পক্ষে লড়াই করে (যেমন—হাসান বিন সাবিত রা.)। এদের প্রশংসা করা হয়েছে।

উপসংহার:

ইসলাম কবিতা বা সাহিত্য চর্চাকে নিষিদ্ধ করেনি, তবে তা হতে হবে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে এবং অশ্লীলতামুক্ত।

১৫২. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"-এর তাফসীর কর।

উত্তর:

(নোট: এই আয়াতটি মূলত সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াত, তবে প্রশ্নপত্রে এটি সূরা শুআরা অংশে থাকায় এখানে উত্তর দেওয়া হলো)

ভূমিকা:

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ‘রহমত’ বা দয়া। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে তাঁর হাবিবের বিশ্বজনীন দয়ার স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

আয়াতের অর্থ:

“আমি তো আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।”

তাফসীর ও ব্যাখ্যা:

১. লিল আলামিন (সমগ্র সৃষ্টির জন্য): রাসূল (সা.) কেবল আরবদের জন্য বা মুসলমানদের জন্য রহমত নন; তিনি মানুষ, জিন, পশুপাখি, উদ্ভিদ—এমনকি জড় পদার্থের জন্যও রহমত। তাঁর আগমনের ফলে পুরো সৃষ্টিজগত ধন্য হয়েছে।

২. মুমিনদের জন্য রহমত: তিনি মুমিনদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন, যার ফলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়েছে। এটি তাঁর হেদায়েতের রহমত।

৩. কাফেরদের জন্য রহমত: পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর যেমন আসমানি আজাব (পাথর বৃষ্টি, ভূমিধস) এসে তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিত, নবীজির সম্মানে আল্লাহ এই উম্মতের কাফেরদের ওপর থেকে সেই ‘আজাবে ইস্তিসাল’ (সমূলে বিনাশ) তুলে নিয়েছেন। তারা তাঁর দয়ায় দুনিয়াতে বেঁচে থাকার সুযোগ পাচ্ছে।

উপসংহার:

রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন মূর্তমান রহমত। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করলেই পৃথিবীতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নিশ্চিত হবে।

---

১৫৩. সূরা আশ শুআরায় উল্লিখিত কতিপয় নবীর নাম উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আশ শুআরাকে নবীদের দাওয়াতের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ বলা যায়। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা সাতজন মহান নবীর ঘটনা এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের পরিণতির কথা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

উল্লিখিত নবীগণ:

১. হযরত মুসা (আ.): সূরার শুরুতে মুসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। লাঠি ও হাতের মুজিজা এবং জাদুকরদের ঈমান আনার ঘটনা এখানে মুখ্য।

২. হযরত ইব্রাহিম (আ.): মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক এবং পরকালের জন্য তাঁর বিখ্যাত দোয়াসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. হযরত নূহ (আ.): প্রথম রাসূল হিসেবে তাঁর দাওয়াত এবং মহাপ্লাবনের মাধ্যমে কওমের ধ্বংসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৪. হযরত হুদ (আ.): আদ জাতির নবী, যারা উচু স্তম্ভ নির্মাণে গর্ব করত।

৫. হযরত সালেহ (আ.): সামুদ জাতির নবী, যারা পাহাড় কেটে ঘর বানাত।

৬. হযরত লুত (আ.): যাঁর কওম অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিল এবং পাথরের বৃষ্টিতে ধ্বংস হয়েছিল।

৭. হযরত শুয়াইব (আ.): 'আসহাবুল আইকা' বা বনবাসীদের নবী, যারা ওজনে কম দিত।

উপসংহার:

এই সব নবীর দাওয়াতের মূল কথা ছিল এক—'আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো'। তাঁদের ঘটনাগুলো শেষ নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য শিক্ষণীয়।

---

১৫৪. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ"-এর অর্থ কী?

উত্তর:

(নোট: এই বাক্যটি হুবহু সূরা আল বাইয়্যিনার ৫ নম্বর আয়াতে আছে—'ওয়ামা উমিরু...'। সূরা শুআরায় হুবহু নেই, তবে সব নবীর দাওয়াতের সারমর্ম হিসেবে প্রশ্নটি করা হয়ে থাকতে পারে। তাই এর সাধারণ অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া হলো)

ভূমিকা:

সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূল ভিত্তি এবং মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হলো এক আল্লাহর ইবাদত। এই আয়াতে সেই চিরন্তন সত্যটিই তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

"তাদেরকে এছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।"

অর্থ ও তাৎপর্য:

১. ইখলাস (একনিষ্ঠতা): ইবাদত কেবল রুকু-সিজদার নাম নয়। ইবাদতের প্রাণ হলো ইখলাস বা নিরেট খুলুসিয়ত। লোকদেখানো বা দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য করা কাজ আল্লাহর কাছে ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না।

২. তাওহীদ: 'লি-ইয়াবুদুল্লাহ' মানে হলো কেবল আল্লাহর দাসত্ব করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা রাজনৈতিক—আল্লাহর হুকুম মেনে চলাই হলো প্রকৃত ইবাদত।

৩. দ্বীনের সারকথা: নামাজ কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং শিরক মুক্ত থাকা—এগুলোই সঠিক দ্বীন বা 'দ্বীনুল কাইয়্যিমা'। পূর্ববর্তী সব কিতাবেও এই একই নির্দেশ ছিল।

উপসংহার:

মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হলো যাবতীয় শিরক ও লৌকিকতা মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন অতিবাহিত করা।

১৫৫. আল্লাহ তায়ালার বাণী "إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ"-এর অর্থ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

মক্কার কাফেররা কুরআন মজিদকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করত এবং একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নানা অপবাদ দিত। সূরা আল ফুরকানের ৪ নম্বর আয়াতে (এবং ভাবার্থ সূরা শুআরায়) তাদের এই স্পর্ধানূলক উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

"কাফেররা বলে, এটা (কুরআন) তো এক মিথ্যা যা সে (মুহাম্মদ) উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য এক সম্প্রদায় তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।"

ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষাপট:

১. মিথ্যা অপবাদ: কাফেররা দাবি করত যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজে বসে বসে এই কুরআন বানিয়েছেন। তারা একে 'ইফক' (ডাহা মিথ্যা) ও 'ইফতিরা' (মনগড়া রচনা) বলত।

২. ষড়যন্ত্রের অভিযোগ: তারা আরও বলত যে, মুহাম্মদ (সা.) একা এটা লেখেননি, বরং আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিস্টান) বা অনারব দাসরা তাকে পুরনো কিসসা-kahini শিখিয়ে দিয়েছে এবং তিনি তা সাজিয়ে বলছেন।

৩. আল্লাহর জবাব: আল্লাহ তায়ালা তাদের এই দাবিকে 'জুলুম ও জুর' (মিথ্যা ও অন্যায়) বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ নিরক্ষর নবীর পক্ষে এমন অলৌকিক গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব।

উপসংহার:

এই আয়াতটি কাফেরদের হঠকারিতা এবং সত্যের বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যাচারের স্বরূপ উন্মোচন করে। কুরআন যে মানব রচিত নয়, তার প্রমাণ এর অলৌকিকতা নিজেই।

---

১৫৬. সূরা আশ শুআরা-এর মূল বার্তা কী? (ما الرسالة الاساسية لسورة الشعراء؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আশ শুআরা মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ছত্রে ছত্রে তাওহীদ, রিসালাত এবং আখেরাতের বার্তা ধ্বনিত হয়েছে।

মূল বার্তা:

১. রিসালাতের সত্যতা: মহানবী (সা.) কোনো কবি বা জাদুকর নন, আর কুরআন কোনো কবিতার বই নয়। এটি বিশ্বজাহানের রবের পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে নাযিলকৃত সত্য কিতাব।

২. ইতিহাস থেকে শিক্ষা: পূর্ববর্তী সাতটি জাতির (নূহ, আদ, সামুদ ইত্যাদি) ধ্বংসের কাহিনি শুনিয়ে মক্কার কুরাইশদের সতর্ক করা হয়েছে। বার্তাটি হলো—নবীদের অস্বীকার করলে এবং আল্লাহর আজাব নিয়ে বিদ্রূপ করলে পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়।

৩. নবীর সান্ত্বনা: কাফেরদের অবিশ্বাসে নবীজি (সা.) যে মনোকষ্ট পেতেন, তা দূর করার জন্য আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন যে, সব নবীর সাথেই এমন আচরণ করা হয়েছে। হেদায়েত আল্লাহর হাতে।

৪. কুরআনের অলৌকিকতা: এই কিতাব আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ববর্তী কিতাবেও (জুবুরুল আউয়ালিন) ছিল।

উপসংহার:

সূরাটির মূল নির্যাস হলো—সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত এবং মিথ্যার পতন অনিবার্য। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো অহংকার ত্যাগ করে সত্যের পথে ফিরে আসা।

---

১৫৭. হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনির শিক্ষা কী? (ما هى العبرة من قصة نوح عليه السلام؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আশ শুআরায় হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত ও সংগ্রামের কাহিনি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাটি কেয়ামত পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলিগের পথে চলা মুমিনদের জন্য এক অফুরন্ত শিক্ষার উৎস।

শিক্ষাসমূহ:

১. নিঃস্বার্থ দাওয়াত: নূহ (আ.) তাঁর কওমকে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে।" দাঈদের কাজ হতে হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

২. শ্রেণীবৈষম্য বিলোপ: কাফের নেতারা গরিব ও দুর্বল ঈমানদারদের 'ইতর' বা নিচু লোক বলে উপহাস করত এবং তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার শর্ত দিত। নূহ (আ.) তা প্রত্যাখ্যান করে শিখিয়েছেন যে, ঈমানের ক্ষেত্রে ধনী-গরিবের কোনো ভেদাভেদ নেই।

৩. ধৈর্য ও ইস্তিকামাত: সাড়ে নয়শো বছর ধরে বিদ্রূপ ও নির্যাতন সহ্য করেও তিনি দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করেননি। এটি দাঈদের জন্য ধৈর্যের পরম শিক্ষা।

৪. পরিণতি: সংখ্যা গরিষ্ঠতা কোনো কাজের বিষয় নয়। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ধ্বংস হয়েছে, আর নগণ্য সংখ্যক ঈমানদার মুক্তি পেয়েছে।

উপসংহার:

নূহ (আ.)-এর ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সাহায্য মুমিনদের সাথেই থাকে, তা তারা সংখ্যায় যত কমই হোক না কেন।

---

১৫৮. সূরা আশ শুআরায় বর্ণিত কেয়ামতের প্রধান লক্ষণগুলো কী? (ما هى ابرز علامات يوم القيامة المذكورة فى سورة الشعراء؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

সূরা আশ শুআরায় কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য এবং আখেরাতের বিচার দিবসের অবস্থা সম্পর্কে মুমিনদের সতর্ক করা হয়েছে। যদিও এখানে কেয়ামতের আলামতের চেয়ে কেয়ামত দিবসের পরিস্থিতির বর্ণনা বেশি, তবুও কিছু বিশেষ লক্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

লক্ষণ ও অবস্থাসমূহ:

১. সম্পদ ও সন্তানের অসারতা: আল্লাহ বলেন, "সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; একমাত্র যে সুস্থ অন্তর (কালবে সেলিম) নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে, সেই মুক্তি পাবে।" (আয়াত: ৮৮-৮৯)। এটি কেয়ামতের দিনের চূড়ান্ত বাস্তবতার লক্ষণ।

২. জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকাশ: সেদিন মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে এবং পথভ্রষ্টদের জন্য জাহান্নাম উন্মোচিত করা হবে।

৩. উপাস্যদের অক্ষমতা: কাফেররা যাদের পূজা করত, তারা সেদিন তাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। বরং তারা এবং তাদের উপাস্যরা (শয়তান বাহিনীসহ) অধোমুখী হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪. অনুতাপ: অপরাধীরা সেদিন আফসোস করে বলবে, "হায়! আমাদের যদি আবার দুনিয়ায় যাওয়ার সুযোগ থাকত, তবে আমরা মুমিন হতাম।"

উপসংহার:

সূরা শুআরায় কেয়ামতের এই চিত্রগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে সরিয়ে আখেরাতমুখী করা এবং 'কালবে সেলিম' বা পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা।